Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-II, January 2026, Page No. 1-15
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.02W.043

সতীনাথের ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’: অপরমাত্রিক বাস্তবতার নিবিড় পর্যবেক্ষণ

ড. নন্দিতা রায়, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভ. ডিগ্রি কলেজ, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 25.01.2026; Accepted: 28.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the most resplendent Bengali novelists who hails from the province of Bihar, Sathinath Bhaduri, was flowing by the reader’s excitement after writing Jagoree, had been subsided after publication of ‘Dhorai Charito Manos’, when it comes to portray marginalized character in a heroic demeanor. He has brought the duality of meaning of the word"Other"in his novel"Dhorai Charito Manas"where he has depicted how the mainstream readers found it difficult to accept such a rustic character being treated with such lionized way. It shows how people at that time were segregated in terms of 'they' and 'us' because the protagonist of the novel Dhorai was a limpid being who has a mix character shades that the Aristocraric readership didn't look it well as they considered such character meek and unworthy of such literary magnification. But yet Bhaduri with his brevity of language and a keenness to bring about a transformation in literary canon has made the character the most disputed character who has both the mix of heroic and mundane traits. Bhaduri with the characterization of Dhorai shows that he has the intent and will power to challenge the elite ruling class but he had to face many adversities from society that blocked his path from going ahead in his goal. In this regard it has to be said that Bahduri had broken the iconoclastic image of what literary heroes had once been among the elite class but Bhaduri tried to break this conventional notion of hero worship and rather put an ordinary character like Dhorai as a hero. In the case, one should call him unsung hero who probably had all the desired Attributes to be called a hero but just unlike Sri Rama has been shown as an indisputable hero here Dhorai has become a blurrer hero because the readership was used to read only established writing. Madhusudan Dutta, in his epic MeghnadhBadh" tried to depict Indrajit as a forgotten champion but we all know that it doesn't matter how much exotic quality one possesses, the world will remember only the victor. So, it's evident that, no matter what your purpose of fight is but if you are not holding any might then you would be erased like you never existed.

Dhorai's character shown us that it's hard to get readers who will celebrate such heroes because we have preinstalled notion of heroes as an elite class personnel member but when a rustic character like Dhorai gets such limelight it's hard for the nobility to digest this. Bhaduri has brought to light the most hotly debated conception of 'Other' where he has shown how an invisible yet stark reality demarcate line between those who hold and enjoy power and those who find themselves at the receiving end. Had Dhorai been an elite then today he might have got the same accolade as other stellar popular literary heroes have got.

Keywords: Big Other, Small Other, Dhorai, Master class people, Marginalised people

সতীনাথ ভাদুড়ী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথিতযশা লেখক যার সাহিত্যে আঞ্চলিকতা, রাজনীতি, বস্তুজগত, বা বাস্তববাদ, মনোবিকলনতত্ত্ব এক অন্যতর মাত্রা সংযোজন করেছে। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ এবং ভারতীয়দের দ্বারা তা প্রতিহত করার গভীরতর আন্দোলনের প্রেক্ষিতকে বুকে লালন করে যাঁর ভুমিষ্ঠ হওয়া এবং তদপরবর্তী সময়ে ভারতের মৃত্তিকা জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিচিত্র অভিমুখকে সাথী করে যিনি বড় হয়ে উঠেছেন, স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছর দুয়েক আগে যিনি 'জাগরী'র মতো ব্যতিক্রমী উপন্যাসের রূপকর্তা হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছেন, তিনি যে বৈচিত্র্যকেই প্রাধান্য দেবেন, বহুমুখীনতাই যে তার রচনার মৌল আকল্প হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশক জুড়ে রাজনীতির নানা ঘাত প্রতিঘাত সতীনাথের ব্যক্তি জীবনের গতিবিধিকে যেমন নিয়ন্ত্রন করছিল, তেমনি রাজনীতির উত্তাল হাওয়া তাঁর সাহিত্য যাত্রাপথের নান্দীমুখও তৈরি করে দিচ্ছিল। কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজে যেমন কারাবরণ করেছেন, তেমনি জনমানসকে ব্যাপকভাবে জানার ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগও পেয়েছিলেন অনায়াসে। পরবর্তীকালে 'জাগরী' বা অন্যান্য উপন্যাস রচনার উৎস হিসেবে কাজ করেছিল এই সময়ের অভিজ্ঞতা। কিন্তু রাজনীতি এই অভিসন্দর্ভের উৎস নয়। একজন সাহিত্যিক শুধুমাত্র সমকালীন রাজনীতিকে আধার করে তাঁর রচনার বুনিয়াদ তৈরি করেন না, তাঁর সৃজনের মূলে থাকে সমাজবীক্ষণ,মানবিক জীবনদৃষ্টি। প্রান্তজনের যন্ত্রনাকে আত্মীকরণ করে সমাজ সংস্কারের রূপচিন্তক হিসেবে সাহিত্যে কলম ধরেন বহুমাত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী লেখকেরা। সতীনাথ ছিলেন এমনই একজন ব্যতিক্রমী অকপট, অকৃত্রিম, প্রজ্ঞাদীপ্ত লেখক, যিনি ভিন্নপথের পথিক, ভিন্নদিশার দিশারী। তাই জাতীয় জীবনে রাজনীতির বিবিধ সমীকরণ, কিম্বা সামাজিক শোষণ বা বঞ্চনা- সবেতেই সতীনাথ গভীরে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন।অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখাতে চেয়েছেন ব্রিটিশ-ভারতীয় রাজনীতিতে কীভাবে বড়ো মাছ ছোটো মাছকে গিলে খেয়ে মাৎস্যন্যায়ের ধারা জারি রাখে, বর্ণজয়ী প্রতাপশালীগোষ্ঠী চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদর্শন করে প্রান্তিকজনের উপর আধিপত্যের মায়াজ্বাল বিস্তার করে। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসে ক্ষমতাবান ও ক্ষমতাহীনের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান কীভাবে অপরায়নের বৃত্ত রচনা করে দিয়ে 'বড় অপর' ও 'ছোটো অপরের' জন্ম দেয় এবং ছোট অপর কীভাবে প্রতাপের কৃৎকৌশলের কাছে নতি স্বীকার করায় যথাপ্রাপ্ত অবস্থান আরও জোরালো হয়ে উঠে—এসবই হবে এই অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য বিষোয়। জন্মগত কারণে যারা ব্রাত্য হয়ে জন্মায়,তারা যতই মানবিক হোক, নেতা হওয়ার সমস্ত গুণ থাকলেও তাদের মাথায় কখনও বিজয় তিলক উঠে না, তারা চাইলেও রামচন্দ্র হতে পারেনা, মূলস্রোতের বাসিন্দা হিসেবে স্বীকৃতি জানায় না তথাকথিত হেগেমনীবর্গ।

অপরমাত্রার সংজ্ঞা ও স্বরূপ:

বাংলা ব্যাকরণে 'অপর' শব্দ সর্বনাম ও বিশেষণ স্বরূপ; সাধারণত other শব্দের ইংরেজি অর্থ হচ্ছে 'one of two'- অর্থাৎ দু'য়ের মধ্যে একটি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবৃহৎ অভিধান 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'- এ যে অর্থগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে পাই- অন্য, ভিন্ন, পৃথক, তারতম্য, ইতর, নিকৃষ্ট, অশ্রেষ্ঠ, অন্যজাতীয়, বিরোধী, প্রতিকূল, ব্রাত্য, বিজাতীয়, পিছিয়েপড়া ইত্যাদি। এছাড়াও এমন কিছু প্রতিশব্দ আছে, যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত অর্থাৎ পূর্বোক্ত অর্থগুলোর বিপরীতার্থ বহন করে। যেমন আত্মীয়-স্বজন, মিত্র ইত্যাদি। একই শব্দের অর্থ শত্রুও, আবার মিত্রও- এমনটা কিছুতেই ভাবা যায় না। আবার আর এক দিক থেকে চিন্তা করলে যে নয় পর, সেই হলো অপর। অপর শব্দ এই যে দুই বিপরীত অর্থদ্যোতক, তার একটা সানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মনোবিশ্লেষক লাঁকার দর্শন চিন্তায়।

যদিও জাঁ পল সার্ত্র তাঁর 'Being & Nothingness' গ্রন্থে অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রচারে self & other শব্দটি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন বস্তুত self & other এর সংজ্ঞা, তাদের মধ্যে সম্পর্ক কী এবং সত্তার নিজেকে আবিষ্কার ও পরিচয় শনাক্ত করার মাধ্যমে। তবে আজকের উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় যে other এর সংজ্ঞা পাই, তার মূল কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মনোবিকলনতত্ত্ব এবং সাংস্কৃতিক চিন্তক জেকুয়াস লাঁকার 'অপর' এর দ্বিবিধ সংজ্ঞা ও স্বরূপের মধ্যে নিহিত। জেকুয়াস লাঁকার অপর সম্পর্কিত দর্শন ও চিন্তন খানিকটা বিভ্রান্তির আবহ সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনার জাগরণে এটি অবশ্যই মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

মনোসমীক্ষক ও পোস্ট মডার্ন চিন্তক লাঁকা যে দুই অপরের কথা বলেছেন, তার একটা 'বড় অপর ' আরেকটা 'ছোট অপর'। বড় অপর আর কেউ নয় নিজেরই আরেক প্রতিবিম্ব। লাঁকার দর্শনানুসারে:

> The other with the capital 'O' has been called the grandautre By Lacan, the great Other, in whose gaze the subject gains identity. The Symbolic Other is not a real interlocuter but can be embodied in other subjects such as mother or father that may represent it. The Symbolic Other is a ' transcendent or absolute pole of address summoned each time that subject speaks to another subject. Thus, the Other can refer to the mother whose separation from the subject locates her as the first focus of desire, it can refer to the father whose Otherness locates the subject in the Symbolic order' it can refer to the unconscious itself because the unconscious is structured like a language that is separate from the language of the subject. Fundamentally, the Other is crucial to the subject because the subject exists in its gaze. Lacan says that ' all desire of the subject is the desire to be' because the first desire of the subject is the desire to exist in gaze of the Other.[১৫]

অন্যদিকে

> " ..... the other with the 'o' designates the other who resembles the self, which the child discovers when it looks in the mirror and becomes aware of itself a separate being. When the child, which is an uncoordinated mass of limbs and feelings see its image in the mirror, that image must bear sufficient resemblance to the child to be recognized that it must also be separate enough to ground the child's hope for an 'anticipated mastery' ; this fiction of mastery will become the basis of the ego. This other is important in defining the identity of the subject."[১৬]

সুতরাং উত্তর-ঔপনিবেশিক চেতনায় 'বড় অপর' Can be compared to the imperial centre, imperial discourse or the empire itself, যেখানে ছোট অপর 'can refer to the colonized other who are marginalized by imperial discourse, identified by then difference from the centre and perhaps crucially become the focus of anticipated mastery by the imperial 'ego'.

লাঁকার দ্বিস্তরীয় অপরীকরণের বাইরে অপর সম্পর্কে আরেক গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পাই, 'alterity', লাতিন শব্দ alterias শব্দ থেকে যার ব্যুৎপত্তি। এর অর্থ, 'the state of being other or different, diversity, otherness'- এখান থেকেই এসেছে alternate, alteration, alter, ego ইত্যাদি শব্দ। মিখাইল বাখতিন শব্দটি কাজে লাগিয়েছেন 'লেখকের আত্মসত্তা ও তার সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে ক্রমব্যবধানের' সূত্রায়নে। একজন লেখক তার সৃষ্ট চরিত্রকে গভীরভাবে আপনসত্তার দ্বারা উপলব্ধি করবেন কিন্তু খেয়াল রাখবেন যে সেই চরিত্রটি তিনি নিজে নন বরং একজন অপর। স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির পার্থক্য-অপরত্ব। অপরের সংলাপ ও আচরণ গড়ে তুলতে যা অনিবার্য শর্ত।[১৭]

উত্তর ঔপনিবেশিক আলোচনায় এই শব্দার্থ ছাপিয়ে গেছে ভিন্নবোধকতার পরতে পরতে। 'The self identity of the colonizing subject, indeed the alterity of colonized others, an alterity determined, according to Spivak, by a process of othering. The possibility for potential others has also remained in important aspect of the use of the word, which distinguishes it from its synonym.[১৮] ঔপনিবেশিকতা যে অপরত্ববোধকে প্রশ্রয় দিয়েছিল এবং যে অপরত্ব আজ ক্রমাগত আপন সমীহের দাবি নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধের তৎপরতাকে জিইয়ে তুলেছে, তার মূলে আছে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ধর্মীয়, বর্ণগত, লিঙ্গগত, অঞ্চলগত, ভাষাগত ইত্যাদি প্রেক্ষাপট। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে অপরায়নের প্রক্রিয়া কীভাবে ক্রিয়াশীল, সংক্ষিপ্তাকারে একটু আলোচনা করা যাক-

পুরোনো সামন্ততন্ত্র থেকে শুরু করে অধুনা সমাজব্যবস্থায় দুই অসমবর্গের অবস্থান- যার একদিকে আধিপত্যবাদী হেগেমনীবর্গ, অন্যদিকে নি:স্ব-দরিদ্র প্রলেতারিয়েতরা। দ্বিবিধ অপরীকরণে তারাই সক্রিয়পক্ষ, যাদের হাতে নির্ণায়ক ক্ষমতা থাকে। বলা বাহুল্য, আর্থিক বলই নির্ণায়ক ক্ষমতার প্রধান মাপকাঠি। আর্থিক শক্তিকে কুক্ষিগত করে একশ্রেণি হয়ে ওঠে উত্তম অপর, আর বাকিরা অধম অপর। উত্তম অপরেরা অপরীকরণসূত্রে নিজেকে যেমন নির্মাণ করেন, একই সাথে অন্যকেও। অবধারিতভাবে তাঁরা নিজেকে মাপেন বড় ও মহৎ করে, আর অন্যকে ছোট ও নিকৃষ্ট করে। উভয়পক্ষের মাঝে একতরফা ব্যবধানের বৃত্তায়ণ অঙ্কিত হয় যা সম্পূর্ণভাবে স্বকপোলকল্পিত,একমাত্রিক,ব্যঞ্জনাহীন।

ব্রিটিশ শক্তি ও এর অধীনস্থ ভারত: বড়ো অপর ও ছোটো অপরের বৌদ্ধিক বিন্যাস:

আর্থিক ও রাজনীতিগতভাবে প্রচণ্ড শক্তিধর দেশ 'গ্রেট ব্রিটেন' 1765 খ্রি: ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থাপনের মধ্য দিয়ে উপনিবেশ বিস্তারের জয়যাত্রা ঘোষণা করে। বিজিত ভারতবর্ষ থেকে তারা এতো বিপুল পরিমাণে অর্থ-সম্পদ, সাংস্কৃতিক শিল্প-ভাস্কর্য ছিনিয়ে নিয়ে যায় যে পরাধীন ভারত শুধু বাহ্যিকভাবেই রিক্ত হয় নি, তাদের অধীনস্থ মনের দীনতা আর অন্তঃসারশূন্যতা প্রকটভাবে দেখা দিতে লাগলো তাদের আচরণে-মননশীলতায়, দর্শনে-প্রজ্ঞায়। ব্রিটিশ শক্তি স্বাভাবিকভাবে নিজেদের বড় অপরত্ব বা আমিত্ব প্রতিষ্ঠা আর অধীনস্থ দেশের মানুষের ছোট অপরত্ব বা প্রান্তিকত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলো।

ভারতবর্ষ যেহেতু আয়তনে বিপুল মহাদেশপ্রায়, এবং এর সংস্কৃতিতে যেহেতু 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের' সুর ধ্বনিত হয়, তাই ব্রিটিশ শাসক ও বুদ্ধিজীবীরা ওঠে পড়ে লাগলেন অপরত্বের ছায়া খুঁজতে। বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ শাসক এদেশের অতীত সম্পর্কে যে ছবি এঁকেছেন, তা রীতিমতো কালো, তমসাময়, ভয়ংকর। তাঁদের মতে, এদেশের শাসন ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্রকে প্রাধান্য দেয়, বিচারব্যবস্থা অনড়, অথর্ব; সংস্কৃতিতে নেই যুক্তিবাদ, সমাজের প্রগতি আটকে আছে একজায়গাতেই। আসল কথা প্রাচ্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন আর কুৎসিত দেখাতে পারলেই ব্রিটিশ জ্ঞানবাহকদের আলোকবর্তিকা নিয়ে এদেশে আসা আর খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের একটা সঠিক উদ্দেশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তারা যুক্তিবাদ, গণতন্ত্র আর ব্যক্তিস্বাধীনতার প্লাবনে এদেশকে প্লাবিত করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন।

শুরু করলেন নিজেদের আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাতা দাবি করে। শেক্সপীয়রের সাহিত্য সম্ভার, সপ্তদশ শতকের রাজনৈতিক গৌরবময় বিপ্লব, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের শিল্পবিপ্লব, বাণিজ্যনীতির উদারীকরণ, উনিশ শতকের রোমান্টিক কাব্য, উদারনৈতিক গণতন্ত্র ইংরেজ জাতিরই অবিনশ্বর কীর্তির শ্রেষ্ঠ ফসল। ব্রিটিশ শাসনক্ষমতার ধারক ও বাহকরূপে এদেশে শ্বেতকায় লর্ড কার্জন, সলসবেরি, ডালহৌসি, বেন্টিংক, হেস্টিংস প্রমুখ বিশাল সাম্রাজ্যের সভ্যতা-সঞ্চারী মিশনে হলেন নিবেদিত প্রাণ। পশ্চিমী সভ্যতার সবিস্তার বিবরণ সারা হলো 'we' দিয়ে আর প্রাচ্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্ধকার, অপরিণামদর্শী বয়ান শুরু হলো 'they'

দিয়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তি-প্রযুক্তি, মানবতার পথে এগিয়েছি 'আমরা' আর আদিম গুহামানবের যুগে থেমে আছে 'ওরা'। ওরা হলো আমাদের শিক্ষাদানের বস্তু- 'object', আমরা হলাম ওদের শিক্ষাগুরু- 'subject'. এমনভাবে শেখাবো যাতে ওরা চিরকাল আমাদের অনুগত, বশংবদ, কৃতজ্ঞ থাকে।[১৯] এডওয়ার্ড সাঈদ যখন বলেন- "Orientation is a western style, for dominating, restructuring and having authority over the orient". -তখন তা কথিত বয়ানের সঙ্গে যথার্থই প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের শিক্ষার বস্তু আর নিজেদের শিক্ষক সাজানোর সমূহ প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। তাৎপর্যের ব্যাপার, আজ স্বাধীন হওয়ার বহুবছর কেটে গেছে, একবিংশ শতকের তৃতীয় দশকে দাঁড়িয়েও ভারতীয়রা অপরায়নের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাদের অস্থিতে, মজ্জায় অপরত্বের বোধ এতটাই ছেয়ে আছে যে পশ্চিমী সভ্যতা-সংস্কৃতি, চলন-বলন-ধরন- সবটাই শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে নিজেরাও সেগুলো চর্চা-চর্যায় মেতে উঠেছে। দেশজ প্রেক্ষাপট, মূল্যবোধ, ভাবাদর্শ, আবেগ, অনুভূতিকে বিসর্জন দিয়ে ধার করা সংস্কৃতির বুলি আওড়ে কতদিন একটি জাতি বেঁচে থাকতে পারে সেটাই ভাবনার বিষয়। আসলে ঔপনিবেশিকতার ক্রমঘনীভূত ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে স্বাধীনতা নামক এক গোঁজামিল রাজনৈতিক খেলার মাধ্যমে। ক্ষমতা বদল হয়েছে মাত্র, বিদেশী শাসক থেকে তথাকথিত দেশীয় শিক্ষিত উচ্চবর্গ আর বুদ্ধিজীবীর হাতে ক্ষমতা স্থানান্তরিত হয়েছে। আত্ম তার মুখোশ পাল্টেছে, ক্ষমতার অক্ষ সর্বাত্মক চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে আনুভূমিক হয় নি, অপর মুখ বুঁজে প্রান্তিকতার দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে চলেছে।

ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট অপরায়নের প্রক্রিয়াকে জারি রেখেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের বর্ণভেদ প্রথা কার্যকরী থাকে, একইভাবে পুরুষ তার ক্ষমতার দৌরাত্ম্যে হয়ে যায় আত্ম আর নারীরা ভোগবাদের শিকার হয়ে পাঠকৃতিহীন অধম, অপরে পর্যবসিত হয়। হিন্দু মুসলমান নিয়ে ব্রিটিশরা বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে যে নোংরা রাজনীতি খেলেছিল, স্বাধীনোত্তর পঁচাত্তর বছর পরও এই খেলা সমানে চলছে। কাশ্মীর নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের কাঁদা ছোড়াছুড়ির খেলায় যদি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তা উভয় দেশের সাধারণ মানুষ। যেখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, সেখানে তারা হয়ে যায় তথাকথিত অপর, মুসলিমরা যেখানে সংখ্যায় কম, তারা হয়ে যায় ব্রাত্য। সংখ্যালঘুত্ব কোনো বিমূর্ত নাগরিকতা নয়, তারও একটা নিজস্ব ইতিহাস থাকে, নিজস্ব সন্দর্ভ থাকে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মহাসন্দর্ভ মাৎস্যন্যায়কে জিইয়ে রাখতে কখনোই এদের ছোটখাটো সন্দর্ভকে টিকে থাকতে দেয় না, নস্যাৎ করে দেয়।

অপরায়নের তত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্যিক পাঠকৃতি:

উত্তম অপর আর অধম অপরের এই একরৈখিক স্থূল বিভাজন এখানেই থেমে নেই। সাহিত্যের পাঠকৃতি, ইতিহাসের প্রতিবেদন যেহেতু মানুষের জীবন আর সমাজ বাস্তব নির্লিপ্ত নয়; তাই সেখানেও অপরায়নের প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল। ইতিহাসের পাতা খুললেই দেখা যায় ইতিহাস পুরুষদের অপকর্ম-কর্মের বিবৃতিতে প্রতিবেদন ঠাসা। বঙ্কিমচন্দ্র হা-হুতাশ করেছিলেন বাঙালির নিজস্ব ইতিহাস নেই বলে। তিনি ডাক দিলেন "আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।" বাঙালি যে ইতিহাস লেখা শুরু করলো, তাতে আছে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতং, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম, গৌড়রাজমালা, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, সেন-পালরাজাদের ইতিহাস প্রভৃতি আরও অনেক রাজরাজরাদের কাহিনি-বীরগাঁথা। বাদ পড়লো জীবনযাত্রায় পায়ে হাঁটা পাইক-পেয়াদা,প্রজা-চাষাদের ন্যুব্জ জীবনের ক্লান্তিকর অভিজ্ঞতা আর ক্লেদাক্ত ইতিহাস। হেগেমনিষ্ট রচিত প্রতিবেদনে মেহনতি মানুষের কাহিনি অচল, নারীও তো প্রজা-তুল্য, তাই ইতিহাসে নেই কোনো নারীর অবয়ব-সপরিসর।

অপরায়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে সাহিত্যিক পাঠকৃতিতেও। ইউরোপীয় শিক্ষা ও চেতনায় প্রবুদ্ধ বহু বাঙালি মনীষীই নবজাগরণের বার্তাবাহক হয়ে কাজ করেছেন যা তাঁদের ইতিহাসের পাতায় অমর করে রেখেছে। সাহিত্যের অঙ্গনেও তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ- বহু ধীমান মনীষীর অক্লান্ত প্রয়াসে বাংলা সাহিত্য আজ আঞ্চলিকতার সীমা ছাড়িয়ে দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শ্রেষ্ঠভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হবার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু সত্যিই কি বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিটি কোনের মানুষ এই গৌরবে নিজের আনন্দের অংশটুকু খুঁজে পায়? উনিশ শতকের নবজাগরণের সময় থেকে স্বাধীনতা উত্তর কাল পর্যন্ত বাংলার তাবড় সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে বাংলাদেশ, তৎ-সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিটি মানুষই কি তাদের ভাষা-পরিসর-অস্তিত্বের সন্ধান পায়? উত্তরের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারস্থ হওয়া যাক। বঙ্কিমের উল্লেখ এই কারণে যে, সমগ্র বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাই তাঁকে একবাক্যে সাহিত্য-সম্রাট স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম প্রাণপুরুষ, যুগের প্রতীকবাণী,'বন্দেমাতরম' তাঁর কলম- নিঃসৃত স্বাধীনতার সঞ্জীবনমন্ত্র! সেই বঙ্কিমচন্দ্র শেষজীবনে 'সহজ রচনা শিক্ষায়' লিখেন– "গ্রাম্যতা কেবল ইতরলোক বা গ্রাম্যলোকের মধ্যে যেসকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। 'কৌশল্যার পো রাম', 'দশরথের বেটা লক্ষণ'- এসকল বাক্য গ্রাম্যতাদোষে দুষ্ট।"

উল্লেখ্য যে, অপর শব্দের আভিধানিক যেসব অর্থ পাই, তার মধ্যে ইতর শব্দটি সমার্থক হিসেবে স্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্র শহর-গ্রাম, ভদ্র-ইতর- এই শ্রেণিবিভাজনের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছেন সাহিত্য শুধুই শহুরে, শিক্ষিত, তথাকথিত ভদ্র, এলিটক্লাস লোকের মধ্যেই বিচরণ করবে। এভাবেই সন্তর্পনে বাংলা সাহিত্যে 'কেন্দ্র','প্রকৃত' 'আত্ম' নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। অন্ধকারে থেকে যায় 'প্রান্ত', 'অপ্রকৃত', 'অপরেরা'। শতকরা আশিরও বেশি গ্রাম্য- অসভ্যদের, সেইসব উনিশশতকী আলোকপর্বের আলোহীনদের প্রতি ঘৃণা, করুণা উপেক্ষা দেখিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে নবযুগ ঘোষিত হলো।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ না করলেই নয়- "শুদ্রকে পত্র লিখিতে গেলে ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শূদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্তব্য।" নবজাগরণের হাওয়াও বঙ্কিমের অন্ধকার মন থেকে জাতিভেদের কুসংস্কারকে দূর করতে পারে নি। তাই লেখায় তৈরি হলো অপর নির্মাণের আরও একটি প্রক্রিয়া। বঙ্কিমী তত্ত্বায়নের স্বাভাবিক মসৃণতায় গড়ে ওঠা এই প্রক্রিয়া আজও প্রবহমান। বাংলা কথাসাহিত্য বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই দেখা যায় কীভাবে সন্তর্পণে অথচ পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এক সুকঠিন 'আত্ম'র বলয় আর সেই সীমানার বাইরে রয়ে গেছে প্রান্তিকেরা; অন্য আরেক সীমানায়। অপর হয়ে গেলো ইতর, অধম নিকৃষ্ট।

বঙ্কিম প্রস্তাবিত আদর্শ রচনা শিক্ষায় সামাজিক অভিমুখ হিসেবে যেমন গ্রাম্যতাদোষ নিষিদ্ধ, তেমনি ভাষাভিত্তিক অভিমুখরূপে কেন্দ্রায়ণ সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। বঙ্কিম অনুগামী লেখকরা ভাবেন কথ্য, অঞ্চলভিত্তিক ভাষায় সৎসাহিত্য লেখা যায় না। সাহিত্যে সাধু-চলিতভাষার মিশ্রণ ঘটলে ব্যাকরণের নিয়মে তা হয়ে যায় গুরু-চন্ডালী দোষ। অর্থাৎ গুরু-চন্ডাল যেমন এক পংক্তিতে বসতে পারে না, সাহিত্যেও অপরায়ণের প্রক্রিয়া নিভৃতে কাজ করে যায়। আত্ম হলো ব্রাহ্মণগুরু, অপর হলো শূদ্রচন্ডাল। উনিশ শতকে কুলীন সাধুভাষা, পরবর্তীকালে মান্য চলিতভাষা বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নেয়। অন্যদিকে অঞ্চলসমূহের ভাষা 'উপ' হিসেবে স্বীকৃত হয়ে প্রান্তিকায়িত অন্যধারার সাহিত্য বলে পরিচিত হয়।

আসলে প্রান্তিক,অপরের সম্পর্কে এই কৌশলজাত নির্মাণ অর্থনৈতিক-সামাজিক আত্মদম্ভ-নির্মিত ক্ষমতার ফসল। বঙ্কিম তথা পরবর্তী অনেক সাহিত্যিকই হিন্দু উচ্চবর্গপুরুষ হিসেবে সেই ক্ষমতাকেই

কার্যকরী করেছেন। কথাসাহিত্যে কেন্দ্র-প্রান্ত, ভাষা-উপভাষা- এই বিভেদ থাকা বাঞ্ছনীয়;- এই মন্ত্রগুপ্তিকে আত্মস্থ করেই একে একে আসেন শরৎ-মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-রবীন্দ্রনাথরা। এরা সকলেই আলোকপর্ব নামক ইউরোপীয় প্রচার দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে দেশের ক্ষুৎপীড়িত, নিগৃহীত মানুষকে জন্তু জানোয়ারের মতো উপেক্ষা করলেন, মধ্যবিত্তের স্বার্থে কিছু সীমিত সামাজিক কাহিনি আর সমাজমুখী সাহিত্য রচনা করলেন। কখনোই নিম্নবর্গের সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানকে স্বাগত জানালেন না। উপর থেকে চাপানো তত্ত্বায়নের ঠেলায় সাহিত্য বা সাহিত্যের ইতিহাসে তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশালবাড়ি থেকে পাবনার কৃষকবিদ্রোহ,সাওতাল বিদ্রোহ সবই আবছা হয়ে রইলো। বীরসা মুন্ডা বা চাঁদ ভৈরবের বদলে শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে পাঠ্যবইতে বর্ণচ্ছটা ছড়িয়ে রইলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে চিত্তরঞ্জন দাশ। উপন্যাস-প্রবন্ধ-গল্প-ডায়েরি-চিঠিপত্র সবকিছুতেই অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষজনের প্রতি সীমাহীন তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা উনিশ শতকের মনীষী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের মধ্যে নিরন্তর বহমান ছিল। সমাজ উন্নয়ন আর সংশোধনের নামে কখনো কখনো সাহিত্যিকদের রচনায় বাণী বর্ষিত হলেও আদৌ কি মূঢ়, ম্লান, মূকমুখে ভাষা জোগানো গেছে? যারা অপরায়নের জগতে বাস করে, তারা তাদের তথাকথিত আঞ্চলিক উপভাষায় আলোকিত কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মানুষের সামনে কথা বলতে লজ্জা পায়। আর সেই ছোটলোকদের ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টিও তাই প্রান্তিক হয়ে যায়। অঞ্চলভিত্তিক ভাষায় লেখা কথাসাহিত্যও বিদ্রুপ করে বলতে পারে না যে কলকাতার ভাষাও এক আঞ্চলিক ভাষা। উপ বা অপরের হাতে কেন্দ্র-নিগ্রহ হবার কোন সম্ভাবনাই তৈরি হয় না।

অসহায় নিম্নবর্গীয় মানুষদের অপর শনাক্ত করেই আত্মজনেরা ক্ষান্ত হন নি, তাদের অবস্থানগত পরিসরকেও করেছেন কেন্দ্র-বিবর্জিত। তাই কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুসম্প্রদায়, এদের বিব্রতকর জীবনযাপন, নাগরিক মধ্যবিত্তের সমস্যাজর্জরিত জীবনকাহিনী, উত্তরণের পথ সন্ধান, কখনও বা সংকটাপন্ন নাগরিক জীবন ছেড়ে পল্লী জীবনের পথে ছুটে চলা, আবার কখনও নাগরিক আর পল্লীজীবনের সমস্যার টানাপোড়েনে ক্লান্ত হয়ে প্রকৃতিতে আশ্রয় ও মুক্তির আস্বাদ লাভের প্রয়াস- এতেও যখন মন স্থিরতা পায় না তখন নিজেরই মনের অন্তর্গহনে ডুবে যাওয়াকেই শ্রেয় মনে করেছেন লেখকেরা। কিন্তু urban society র middle class বা পল্লীগাঁয়ের মানুষকে ছেড়েও জিরানিয়ার অন্তর্গত তাৎমাটুলি আর ধাঙরটুলির নিম্নবর্গীয় ছোটলোকেরাও যে এদেশের মানচিত্র দখল করে আছে, তথাকথিত বুদ্ধিজীবির দল সেসব পরিসরকে সাহিত্যের অঙ্গনে ঠাঁই দেন নি। Excluded area আর তৎসন্নিবিষ্ট মানুষেরা তাই সাহিত্যে অস্পৃশ্য অধরা থেকে গেল।

উপন্যাসে অপর মাত্রা: প্রসঙ্গ ঢোঁড়াই চরিত মানস:

সময়ের কাল প্রবাহে যুগান্তর এনে দিয়ে একজন লেখক কেন্দ্রাভিগ স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য খাতে বইতে শুরু করেছিলেন। যে স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সমালোচকের ভ্রুকুটি আর নিন্দাকে উপেক্ষা করে সাহিত্যিকরূপে একঘরে হয়ে যাবার ভয়কে তোয়াক্কা না করে, মানুষরূপে গণ্য না হওয়া মানুষের কথা আর কাহিনিকে সাহিত্যে নিয়ে আসলেন, তিনি স্বনামে সমুজ্জ্বল সতীনাথ ভাদুড়ী। সাহিত্যের ইতিহাসে এতদিনের কৃষ্ণাঞ্চল আর তার সংলগ্ন মানুষের প্রতি সত্য ও জীবনসন্ধানী আলো নিক্ষেপ করে তিনি দেখিয়ে দিলেন সাহিত্যের পরিসর একমুখী নয়, বহুস্বরিক দ্যোতনায় স্ফুরিত। বিচ্ছিন্ন পরিসরের অচ্ছুৎ, অস্পৃশ্য মানুষদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেখিয়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আয়তনিক অসম্পূর্ণতাকে দূর করে পরিসরের বৃত্তকে সম্পূর্ণ করলেন। সমাজের আলোকিত অংশকে নিয়েই শুধু সাহিত্য চলেনা, নাগরিক মধ্যবিত্তদের পাশাপাশি অন্ধকারাচ্ছন্ন তাৎমাতুলি আর ধাঙরটুলির অশিক্ষিত ঢোঁড়াইরাও সমাজেরই একটা স্রোত, সমান্তরালভাবে প্রবহমান, দ্বিবাচনিকসূত্রে গ্রন্থিত; বাখতিনদর্শিত এই সত্যকে যেন আরো জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সাহিত্যসৃষ্টিতে লেখকেরা এই যে শুধু বাস্তবের আলোকিত জগতের মানুষদের নিয়ে নাড়াচাড়া করতে অভ্যস্ত ছিলেন তা নয়, পাঠকরাও প্রতাপ-নির্দিষ্ট প্রচলিত ছকে বাস্তবের একটা অংশের মানুষের কাহিনি ও জীবনচর্যার ইতিহাস পড়ে পড়ে সেটাকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছিল। তাই 'জাগরী' ছাপা হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিদগ্ধ রসিককুল যতটা খুশি হয়েছিলেন, যেভাবে সতীনাথকে সাদরে সাহিত্য সংসারে বরণ করে নিয়েছিলেন, 'ঢোঁড়াই-চরিত মানস' এর প্রকাশের পর সে উচ্ছ্বাসে যেন ভাঁটা পড়লো। ঢোঁড়াই-চরিত মানস এর ঘটনাভূমি চিরপরিচিত বাংলাদেশ নয়, বিহার। এতে নেই কোন অভ্যস্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি, এর জগৎটা গড়ে উঠেছে অন্ত্যজ ধাঙর আর তাৎমাদের নিয়ে। এর নায়কও মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষিত প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো যুবক নয়, একেবারেই আনপড়, অন্ধকার জগতের বাসিন্দা বিসদৃশ নাম নিয়ে জাত ঢোঁড়াই- যার নামেই খানিকটা পরিচয় পাই। বিষহীন ঢোঁড়া সাপের ন্যায় সেও যেন শক্তি-তেজ-ক্ষমতাহীন প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়েও পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়। বাঙালি পাঠক তাই চেনা জগতের বাইরে গিয়ে অচেনা বাস্তবকে নতুন আঙ্গিকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কলকাতার কেন্দ্রীয় ভাষা ছেড়ে উপন্যাসের বয়ান যখন অন্ত্যজদের নিজস্ব ভাষায় গড়ে ওঠে, সে সময় পাঠকদেরও বারবার পাদটীকার সাহায্যে পড়তে গিয়ে চিরায়ত অভ্যাস বাধাপ্রাপ্ত হয়। হেগেমনীরা প্রতাপের দীর্ঘদিনের কাঠামো ভেঙে যাওয়ার ভয়ে আঁতকে উঠেন। উপন্যাসের প্রান্তিক পরিসর আর অস্পৃশ্য মানুষের অচ্ছুৎ ভাষার সাথে তারা কিছুতেই একাত্ম হতে পারেননি। এ কারণেই দিনের পর দিন চোখের সামনে থেকেও সতীনাথ অধিকাংশ পাঠকের মন থেকে দূরে সরে যান। সতীনাথ জানতেন যে "লেখকের পক্ষে আজকের দিনে সবচেয়ে কঠিন হলো সাংবাদিকতার হাত থেকে লেখাকে বাঁচিয়ে চলা- সবচেয়ে বড় লোভ;" [১] এই লোভ থেকে সন্তর্পনে সরিয়ে নিতে হয় নিজেকে অনেক কষ্টে। তাই সবসময়ে পাঠকের চোখের উপর থেকেও তাদের মনের রুচিতে গড়ে তোলেন নি নিজেকে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পাঠকের মন জিতে নিতে চাননি। তিনি লেখেন তাঁর রচনা পাঠকরা পড়বে, তিনি সমাদৃত হবেন- এই উদ্দেশ্যে নয়; সত্যিকারের সমাজবীক্ষকরূপে তিনি প্রচলিত কাঠামো ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন, ঔপনিবেশিক শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য আর প্রতাপের শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে তাঁর একজন নায়কের দরকার ছিল যে ছাঁচেঢালা নয়, এক্ষেত্রে প্রান্তিকায়িত পরিসর থেকে উঠে আসা অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিনিধি ঢোঁড়াইকেই তিনি নায়কের মর্যাদা দিলেন।

ঢোঁড়াইর চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে সতীনাথ লেখেন "ধূর্ত অথচ অকপট; নিরক্ষর অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম; নিজে অন্যায় করে অথচ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেকোন সময় রুখে দাঁড়াবার সাহস রাখে; স্বার্থপর অথচ একটা অসহায় পশুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত; রঙ্গরসে ভরা বিচিত্র এই ঢোঁড়াই এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমায় আকর্ষণ করত। তাই আমার কাজের পক্ষে অনুপযোগী হওয়া সত্ত্বেও রামের খোঁজে বেরিয়ে তার কথাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিল।"[১০] 'কাজের পক্ষে অনুপযোগী হওয়া সত্ত্বেও রামের খোঁজে বেরিয়ে' কেন তিনি ঢোঁড়াইকেই বাছলেন? আসলে শহুরে নাগরিক জীবনের সমস্যা সামাজিক আর আত্মিক সংকট উত্তরণে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দান- এসমস্তই বিপুলভাবে সাহিত্যের পাতায় উঠে এসেছে। তাৎমাটুলি, ধাংড়টুলির মানুষেরা কীভাবে বেঁচে থাকার জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করছে, নানা ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে,- সেসব নিয়ে কেন্দ্র- অঞ্চলের সাহিত্যিকদের কলম থাকে বন্ধ। অপরায়নের নিরন্তর প্রক্রিয়া জারি থাকায় তাদের নিয়ে রচিত হয় না সাহিত্য। প্রতাপের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে গেলেও যেভাবে রাসবিহারী বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়- এদের নামের আড়ালে হারিয়ে যায় বীরসা মুন্ডা, তীতুমীরেরা; ঢোঁড়াইদের সংগ্রামও অপরায়ন প্রক্রিয়ার নিশ্ছিদ্র গহবর থেকে

বহির্গমনের রাস্তা খুঁজে পায়না। এই শূন্যতাবোধে পীড়িত সতীনাথ বিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জীবন্ত তুলে আনলেন ঢোঁড়াইকে সাহিত্যের পাতায়, করলেন নায়কের আসনে সন্নিবিষ্ট।

ঢোঁড়াইকে এ যুগের রামচন্দ্র তৈরি করতে গিয়ে সতীনাথ অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেননা, ঢোঁড়াই নিষ্কলুষ চরিত্র নয়। ডায়রি থেকে... "সে একবার একটা দুরমোশ চুরি করে ধরা পড়েছিল। আর একবার টাকা খেয়ে জাতের পঞ্চায়েতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে একজনের বিবাহিত স্ত্রীকে অপরের হাতে তুলে দিতে সাহায্য করেছিল।এছাড়া আরও অনেক দোষ ছিল ঢোঁড়াই এর, তার সবগুলোই দারিদ্র্যজনিত নয়।[১১]

এহেন ঢোঁড়াইকে কেন তিনি রামের আদর্শে গড়লেন? আসলে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ বলিষ্ঠ, তেজস্বী, সৎ, সামনে থেকে এগিয়ে এসে নেতৃত্ব দান- এসমস্ত গুণের সমন্বিত ব্যক্তিকেই নায়ক হিসেবে দেখতে চায়, যেমনটা রামের মধ্যে দেখেছিল। বলা বাহুল্য একে ঢোঁড়াই অন্তেবাসী, তায় নিষ্কলঙ্ক নয়, তাই ঢোঁড়াইয়ের ত্রুটিগুলো সরিয়ে কর্তব্যের পথে অবিচল থাকবার দৃঢ়তা ও যেকোনো বাধা ঠেলে পথ করে নেবার সাহস তার মধ্যে নিয়ে এলেন। 'তার স্বভাবের হালকা রঙ্গরসের দিকটা যাতে উচ্চারিত না হয়' সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলেন কারণ ওজিনিস নেতার পক্ষে অশোভন। তিনি লেখেন, "আমার কাজ হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমন ভাবে বদলানো যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গরুর গাড়ি চালক ঢোঁড়াইকে যৌবনে তাৎমাটুলি থেকে সরাতে হলো চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতাবার জন্য। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় ওই শ্রেণির লোকের চরিত্রে যেখানে যা কিছু ভাল নজরে পড়েছিল, সেই সব সদগুণগুলো দিয়ে ঢোঁড়াইকে সাজাতে আরম্ভ করলাম।"[১২]

এতকিছুর পরও 'ঢোঁড়াই- চরিত মানস' এর নায়কের চরিত্রে লেখক তৃপ্ত হননি। তিনি লিখেছেন ডায়রিতে,"... যে বিশালতা ও গভীরতা দিতে চেয়েছিলাম সে চরিত্রে, নিজের অক্ষমতার জন্য তা দিতে পারিনি। ঢোঁড়াইদের চরিত্র মানস-সরোবরের ন্যায় বিশাল ও গভীর। সেইটাকে চেয়েছিলাম এক গণ্ডুষ গল্পের মধ্যে ধরতে। পারিনি।।"[১৩] নায়ক হিসেবে 'ঢোঁড়াই' চরিত্রের যে অপর্যাপ্ততার কথা লেখক বলছেন, তার পেছনে হয়তো উপন্যাসটির কম জনপ্রিয়তাকেই দায়ী করা যায়। সতীনাথ লিখেছেন--"আমার ভিতরের গোপন আমি আমায় শাসাচ্ছে-- আচ্ছা বইখানা যদি খুব বিক্রি হত, তা হলেও কি নায়কের চরিত্রের অপর্যাপ্ততার কথাটা তোমার মনে আসত? তাহলে কি তুমি শুধু উত্তরঢোঁড়াই চরিত কেন উত্তরোত্তরঢোঁড়াই চরিত পর্যন্ত লিখে চলতে না? 'বলতে পারিনা। এমন প্রকল্পিত প্রশ্নের উত্তর আমি দিই না।'[১৪]

সতীনাথ এই 'প্রকল্পিত প্রশ্নের উত্তর' না দিয়ে হয়তো এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু একজন সন্ধানী পাঠক হিসেবে যা মনে হয়, - বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘদিনের নায়ক চরিত্রের আদল সতীনাথের অবচেতন মানসে গাঁথা ছিল। ঢোঁড়াই -চরিত মানস এর প্রচারহীনতা আর কম জনপ্রিয় হওয়ার মূলে তাঁর সচেতন মন তাই ঢোঁড়াইকেই অংশত দায়ী করল।

যাই হোক, বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীবর্গ যেভাবে এতদিন অন্ত্যজদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরার পথে কাঁটাগুল্ম বিছিয়ে রেখেছিলেন, অপরায়ন প্রক্রিয়ায় তাদের বন্দীশালায় আটকে রেখে যেভাবে প্রতাপের চিহ্নায়নে সাহিত্যের পাঠকৃতি সাজিয়েছিলেন, সতীনাথের 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' যেন ওই বন্দীশালার তোরণ ভাঙার সংকেত।

প্রতাপ-নির্মিত কৃৎকৌশল ভেঙে দিতে ঢোঁড়াইয়ের প্রথম বিক্ষুব্ধ পদচারণা তাৎমাটুলির মহতোর (পঞ্চায়েতের মোড়ল) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যমে। গানহী বাওয়ার তাৎমাটুলিতে অতিলৌকিক

আবির্ভাবে বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত রেবনগুণী বা বৌকা বাওয়ারর চাইতেও গুণী হয়ে যাওয়া- এই ঘটনার রেশ ধরে মহতো যখন গানহী বাওয়ার নামে রবিবার কাজে না যাওয়ার ফরমান জারি করতে চাইল, ঢোঁড়াই প্রতিবাদ জানালো- "আমাদের পেট কেটো না মহতো।' ঢোঁড়াই জানে যে রবিবারের দিনই বাঁধা ঘরগুলোতে ভিক্ষে দেয় বেশি। সে বলে ওঠে;- "রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার।"[২] পঞ্চায়েতের নায়েব মহতোরা অর্বাচীনের ধৃষ্টতায় অবাক মানে। তারা গানহী বাওয়ার নাম শুনিয়ে ঢোঁড়াইকে রবিবারের ছুটি মেনে নিতে বাধ্য করান।

প্রতাপের কৃৎকৌশলের কাছে ঢোঁড়াই এই হার কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। পঞ্চায়েতের নিয়মানুসারে তাৎমাদের মাটি কাটার কাজ ছিল নিষিদ্ধ। ঢোঁড়াই এই নিয়মের তোয়াক্কা না করে ধাংড়টুলির শনিচরাকে বলে পাক্কী মেরামতির(রাস্তা মেরামত) কাজে লেগে যায়। শনিচরা ঢোঁড়াইকে পঞ্চায়েত যদি কিছু বলে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে--'তারা কি আমায় খেতে দেয়।' ঢোঁড়াইর কথায় প্রতিবাদের সুর বেজে ওঠে। পঞ্চায়েতের নিয়ম ভাঙার অপরাধে ঢোঁড়াইকে নিয়ে গ্রামে বিচারসভা বসে, ঢোঁড়াইকে ডাকলেও সে আসেনি। নায়েব,মোড়লরা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে- "পঞ্চ যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার। এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার! এ অপমান পঞ্চদের অসহ্য।"[৩] তারা ঢোঁড়াইকে বাড়িতে না পেয়ে তার ঘর জ্বালিয়ে দেয়। থানার বড় দারোগার কাছে পঞ্চরা যখন একের পর এক মিথ্যে সাফাই গাইছিল, ঢোঁড়াই ইচ্ছে থাকলেও মহতো- নায়েবদের পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারেনি। সে চেয়েছিল পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথাগুলিকে নিচু করাতে এমনভাবে, যাতে কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। কিন্তু পিতৃতুল্য বৌকা বাওয়ার চাহনির আদেশ সে অমান্য করতে পারেনি। পারেনি এদের জেলে ঢুকিয়ে ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া খাইয়ে তাৎমাদের গৌরব হানি করতে। ঢোঁড়াইর কোমল হৃদয়ের মানবিকতা আধিপত্যবর্গের প্রকরণের সীমান্ত ভেঙে দিয়ে সেই প্রতিবেদন থেকে সম্ভাবনার আলো বিচ্ছুরণ করতে সে ব্যর্থ হয়।

এই ঘটনার পর মহতো, নায়েবরা মনে মনে বিরূপ থাকা সত্ত্বেও ঢোঁড়াইকে কিছু বলতে পারে না। পাড়ার সকলে কিন্তু ঢোঁড়াইর প্রশংসা করে। বেইজ্জতি আর অসম্মান থেকে জাতকে বাঁচানোয় ছেলে-বুড়োর কাছে ঢোঁড়াইর মর্যাদা বেড়ে যায়। ঢোঁড়াই গভীর আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে।কিন্তু ঢোঁড়াইদের আত্মপ্রত্যয় যে ঠুনকো, প্রতাপের ঐকান্তিক শাসন ও কুটকৌশলের কাছে তাদের কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় অজস্র ঝরাপাতার স্তূপে। কাহিনির ক্রমপরিণতি তারই ইঙ্গিত দেয়।

ঢোঁড়াই তার শৈশবের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে ভাবে, তার বদ মা তাকে ফেলে চলে গিয়েছিল না হয়, কিন্তু কোথায় ছিল তাৎমাজাতের লোকেরা, কোথায় ছিল নায়েব, মহতোরা; বাওয়া ছাড়া তো কেউ তার কথা ভাবে নি। পঞ্চদের 'পঞ্চায়েত' তাকে নিয়ে সেসময় ভাবার অবকাশ পায় না। আসলে ঢোঁড়াইরা ভুলে যায় যে তারা সমাজে না থাকলে নিম্পেশনের ইতিহাস গড়ে উঠবে কী করে; ঢোঁড়াইদের মতো অর্থ-সম্বলহীন হা-ঘরে লোকেরা আছে বলেই প্রতাপ তার অনড় সিদ্ধান্ত নিয়ে রক্ষণশীল একগুয়েমি দেখিয়ে যাচ্ছে।

ঢোঁড়াইরাও চায় পঞ্চায়েতের খোলনলচে পাল্টে দিতে। ত্রিশ দিনের শ্রাদ্ধের বদলে তারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়র মতো তেরো দিনেই শ্রাদ্ধ করতে চায়। তারা পঞ্চায়তির না জরিমানার টাকার হিসেব চায়। মহতো ভাবে- "রাতারাতি বদলে যাচ্ছে তাৎমাটুলি। মরণাধার বালির মধ্যে যেন তার পা আটকে যাচ্ছে।"[৪]

কিন্তু ঢোঁড়াই ব্যর্থ হয় তাৎমাটুলির সমাজকে বদলে দিতে। সে হয়তো প্রতাপ-চিহ্নিত সীমারেখা মুছতে মুছতে এগোয়, নিগড় ভেঙে সীমানার ওপারে সম্ভাবনায় উত্তীর্ণ হতে চায়, 'আত্মতা' ও 'বস্তুত্বের' পুরনো ব্যবধান লুপ্ত করতে চায়, কিন্তু পারে কি? পারে কি সীমান্তহীন অনন্তের দ্যোতনা নিয়ে আসতে? বিয়ে করা

স্ত্রীকে সে রাখতে পারে না নিজের কাছে, পঞ্চায়েতের কূটচক্রের কাছে হার স্বীকার করে নেয়। সামুয়রের কাছে টাকা খেয়ে পঞ্চায়েত যেভাবে ঢোঁড়াই আর রামিয়ার জীবনে বিচ্ছেদ ঘটালো, এতে আবারো প্রমাণিত হলো ক্ষমতা আর প্রতাপের স্বচিহ্নিত সীমা-বহির্ভূত কোনো অস্তিত্বই সমাজ আর জীবনের পাঠকৃতিতে তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তাৎমাটুলি ছেড়ে ঢোঁড়াই যে নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করে সেই কুশবাহাছত্রি বা কোয়েরিটোলার দুনিয়া কি ঢোঁড়াইর জন্য সুখকর ছিল? উপন্যাসের ক্রমবিস্তার কিন্তু আমাদের জানিয়ে দেয় তাৎমাটুলির পঞ্চায়তের চাইতেও ভয়ঙ্কর-সর্বগ্রাসী করাল থাবা নিয়ে বসে আছে আধিপত্য আর প্রতাপের আরেকনাম জমিদার বাবুসাহেব বচ্চন সিং। ঢোঁড়াই যে বাড়িতে কৃষির জমি দেখাশোনার দায়িত্ব পায়, সেই বাড়ির মালকিন সাগিয়ার মা মোসম্মতের কাছে জানতে পারে " যে ভাঙা বাড়িটার উপর অশ্বত্থ গাছ উঠেছে, ঐ যে যার সম্মুখের মাঠে সাঁজের ভজন হয়, সেটা ছিল 'ভক্তাইদের' মঠ। মঠের জমি-জিরেত বেশ ছিল। এর আগের মোহন্ত একটি মুসলমানের মেয়েকে রেখেছিলেন মঠে এনে। শেষ পর্যন্ত তাকে চলে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে। আজকাল ভক্তাইদের ছেলেরাও আর নিজেদের ভক্তাই বলে পরিচয় দিতে চায় না। তাই আজ মঠের এই অবস্থা। যার লাঠি তার মোষ। স্বাভাবিকভাবেই এইসব জমি চলে যাচ্ছে বাবুসাহেবের পেটে। এমনি করেই জমি বাড়ে। জলে জল আনে।কোথা থেকে কেমন করে যে জমি বাবুসাহেবের হাতে চলে যায় তা আগে থেকে লোকের টেরও পায় না।"[৫]

বাবুসাহেবরা কখনো নৈঃশব্দের পরিধির বিস্তার ঘটিয়ে কেন্দ্রচ্যুত হতে চান না। তাই আদর্শ উত্তরসূরি তৈরি করে নেন মূলত প্রতাপের নিরন্তর মাপজোখ ও অভ্যাসের দীর্ঘপরম্পরাকে জারি রেখে। নিজের নাতির মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রতিফলনলব্ধ দম্ভপাঠকৃতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ তৈরি করে দেয়-" শরীরটাও ভালো। রাজপুতী ঠাট রাখতে পারবে।... এ নাতিটা তার গুণ পেয়েছে; বাপকাকার মতো নয়। তাই এটাকে তিনি এত ভালবাসেন। একে তিনি নিজের মনের মত করে তৈরি করে যাবেন। এর মনের মধ্যে গেঁথে দিয়ে যাবেন দুনিয়াদারির অ আ ক খ। বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পৌঁছায় ঐ লাঠিসমেত হাত।... আলের মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু একটু করে।...আস্তে আস্তে এগুবে যাতে কারও নজর না পড়ে প্রথমটায়। তবুও যদি পিঁপড়েগুলো কামড়ায়, তাহলে বুঝিয়ে দিও যে, তুমি রাজপুত। মঠের জমি; নিকাশের জমি; কুশীর ধারের জমি; একদিনে নয়, আস্তে আস্তে।...রসিদ, আঙুলের ছাপ, ফৌজদারী আদালত, দারোগ্ হাকিম কোনোটা ফেলনা নয়।"[৬]

কিন্তু ঢোঁড়াই যে হারতে চায় না, সে কোয়েরীটোলার কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে প্রতিবাদী হবার জন্য।- "সবাই মিলে দলবেঁধে চলো বাবুসাহেবের ওখানে।" ঢোঁড়াইরা বাবুসাহেবের সঙ্গে 'ভে,' করতে আসলে বাবুসাহেব এদের আস্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যান- "তাঁর সম্মুখে কোয়েরীটোলার লোকদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ানো জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের।"

ঢোঁড়াইর নেতৃত্বে কোয়েরীরা এই রীতি-নিয়ম ভেঙে সোজা ধান আর ধানের চারা চেয়ে বসল। বাবু সাহেব সংযত হয়ে ঢোঁড়াইদের কথামতো ধান আর ধানের চারা দিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু টিপসই রেখে যে ষড়যন্ত্রের জাল রচনা করলেন,ঢোঁড়াইদের সাদা মস্তিষ্ক সেই শোষণের কৃৎকৌশল ভেদ করতে পারেনা। গোমস্তাজীকে বাবুসাহেব যখন জিজ্ঞাসা করেন, রাখালরা ফিরেছে কিনা, সেও বুঝে নেয় মালিকের মনের খবর। সে আঙুলের ছাপ দেওয়া সাদা কাগজগুলো মোষরা যে খুঁটিতে বাধা আছে সেখানে নিয়ে যায়। যে মোষের গায়ে কাদা শুকিয়ে গেছে তার শরীরে কাগজগুলো ঘষে ঘষে ময়লা করে নেয়। কাগজগুলোতে কী

লিখতে হবে তা বাবুসাহেবের কাছে জেনে নেয়। বাকি সব কাজ তার জানা। চিনি-গোলা জল খানিক কাগজগুলোর উপর এখানে সেখানে ছড়িয়ে দেয়। তারপর পিঁপড়ে গেলে বাঁশের চোঙার মধ্যে ভরে গুঁজে রেখে দিতে হবে রান্না ঘরের বাতায়। ভূসির মধ্যে রাখার চাইতে এতে জিনিসটা হয় অনেক ভালো।

কোয়েরীদের উপর বাবুসাহেব বাকি খাজনার নালিশ জানালে প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও সামলে নিয়ে অনিরুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে তারা পরামর্শ করে এবং সমন না নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বাবুসাহেব ঢোঁড়াই ও কোয়েরীদের শায়েস্তা করতে তাদেরই জাতের মোড়ল গিধর মণ্ডলকে নিজের দলে নিয়ে আসেন। গিধর মন্ডলও জানে যে ঢোঁড়াইকে শায়েস্তা করতে হলে রাজপুতদের সাহায্য নিতেই হবে। একস্বরসংগতি জিইয়ে রাখতে বাবুসাহেব-গিধর মন্ডল উভয়ে মিলে প্রতাপের যৌথ কার্যকরী রণকৌশল ঠিক করে নেন।

বাবুসাহেবকে এতদিন বাড়ি থেকে পাকা রাস্তায় যেতে হলে গ্রামের একমাত্র মহিলারায়ত মোসম্মতের জমির আলের উপর দিয়েই পাক্কীতে উঠতে হত, যা কিনা জমিদার বচ্চন সিংয়ের আধিপত্যের অহংকারে আঘাত লাগত। গিধর মণ্ডলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে জাতের মানুষের অশিক্ষা আর কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে যেভাবে মোসম্মৎকে ডাইনি সাজিয়ে জমিছাড়া করে ভূমিকম্পে উঁচু হয়ে যাওয়া জলাভূমিতে নির্বাসিত করলেন বাবুসাহেব, তাতে আবারও একবার শক্তিহীনদের জীবনের রুদ্ধতাই প্রতিষ্ঠিত হলো।

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিসকান্ধা আর কোয়েরীটোলায় মহাত্মাজীর আগমন ঢোঁড়াইদের জীবনে নতুন বার্তা নিয়ে আসে। মহাত্মা যখন বলেন- "পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।... অচ্ছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সইতে পারেননি।... এই বিপদে কত লোক জেরবার হয়ে গিয়েছে। রামজীর উপর বিশ্বাস রাখবে। সমাজে যে সবচাইতে নিচে আছে, তার সঙ্গেও ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে। তবে না পৃথিবীতে রামরাজ্য ফিরে আসবে। [৭]

ঢোঁড়াই মহাত্মাজী প্রেরিত ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। মহাত্মাজীর সঙ্গে কাজ করে দেশের স্বাধীনতা আনতে ঢোঁড়াই দৃঢ়প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু এখানেও ঢোঁড়াই লক্ষ করে স্বরাজের বিরুদ্ধে বাবুসাহেব, গিধর মন্ডল, ইনসান আলি, আড়গড়িয়া, দারোগাসাহেব, - সবাই ইংরেজির পক্ষে কাজ করে যায়। শুধু কী তাই! যারা স্বরাজের নামে মহাত্মার সঙ্গে কাজ করে তাদের মধ্যেও কী লোভ-লালসা-ক্ষমতার দ্বন্দ্ব! লাডলীবাবু (বাবুসাহেবের ছেলে) মুখে বলে মাস্টার সাহেব 'চেরমেনে' হবে কিন্তু কার্যত দেখা যায় লাডলীবাবুই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের 'চেরমেন' হয়ে যায়। বিহারে কংগ্রেস গদি ছাড়লেও লাডলীবাবু চেরমেনের পদ ছাড়তে পারেনা ক্ষমতার লোভে।

বাবুসাহেব কোয়েরীদের ধানের বীজ দিয়ে সাদাকাগজে যে টিপসই রেখেছিল, তাতে লেখা হয় এদের এক বছরের জন্য জমি দেওয়া হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পরও তারা জমি বেদখল করে যাচ্ছে। ঢোঁড়াইরা বহু লড়াই করেও 'বুড়ো আঙুলের কানুন'এর কাছে হেরে যায়। ঢোঁড়াইরাও বুঝতে পারে বাবুসাহেব, রামনেওয়াজ মুন্সীর মতো বিশ্বাসঘাতক আর অর্থগৃধ্নুরা থাকলে যে একটা টিপসইয়ের চাপে ভিটেমাটি-ছাড়া হতে হবে- সেটাই স্বাভাবিক। লাডলীবাবু-যার ভেতরে এক রূপ, বাইরে আরেকরূপ-ঢোঁড়াইদের মতো সাদাসিধে লোকের পক্ষে বাবুসাহেবের চেয়েও সে বেশি ভয়ংকর! লাডলীবাবুর মতো ছেলের জন্য বাবুসাহেবও গর্ববোধ করেন - "ধন্যি সেই আওরাত যে এই চেরমেন সাহেবের মতো ছেলে পেটে ধরেছিল।" লাডলীবাবুর গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা, ভোল পাল্টে নিয়ে নিজের আখের গোছানো,- এসবই ঢোঁড়াইয়ের কাজের গতিতে ছেদ এনে দেয়। ইংরেজ-জার্মান লড়াইয়ের সময় কংগ্রেস বিহারের গদি ছেড়ে দিলে এই লাডলীবাবুই বলে ওঠেন- "মন্ত্রীর গদি ছেড়েই কাংগ্রিস ভুল করেছে। আরও করবে যদি ডিস্টিবোড

ছাড়ে। হারলে তো সরকারেরই সুবিধা। সরকার ডিস্টিবোডের সব পয়সা লড়ায়ের কাজে লাগাবে।... 'ন এক পাই, ন এক ভাই' বলে জেলে চলে গেলেই আংরেজ হেরে গেল আর কী! আমি তো সাফ বলে দিয়েছি যে, চেরমেনের পদ থেকে আমি ইস্তফা দেব না।" ঢোঁড়াই দেখে কীভাবে লাডলীবাবুরা ভালোমানুষীর তকমাআঁটা খোলস ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে; দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয় সংকীর্ণ স্বার্থ আর ক্ষমতার লোভে। কীভাবে প্রেতায়িত ঔপনিবেশিকতার ছায়াকে প্রলম্বিত করে জীবনের সন্দর্ভ পাল্টে দেয়।

ঢোঁড়াই যে আজাদ দস্তায় প্রবেশ করে, সেখানেও দেখে ভোপতলাল, বিসুন শুক্লা, বলান্টিয়র, বাচিতর সিং, সর্দার- এদের মধ্যে কে কার চাইতে বড় নেতা, কথার ফুলঝুরি কে বেশি ছড়াতে পারে- এ নিয়েই নিয়ত লড়াইয়ে ব্যস্ত। যে বৃহৎ স্বার্থে তারা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তা রাহুগ্রস্ত হয়ে পড়ে ক্ষুদ্রস্বার্থ আর দলাদলিতে। ঢোঁড়াই আর বিশুনি কেওট পাহারা দিতে যে রাতে একসঙ্গে ডিউটিতে যায়, সেদিনই ঢোঁড়াই জেলে যায় আজাদদস্তার ভেতরের রেষারেষিতে। বিশুনি কেওট ঢোঁড়াইকে বলে, ভোপতলাল, বিসুন শুক্লা, বলান্টিয়র, বাচিতর সিং, প্রত্যেকে 'গান্ধী', 'আজাদ', জওয়াহর', 'প্যাটেল', ছদ্মনাম নিয়ে কীভাবে নিজেকে নিজে বড় নেতা ভাবে, কিন্তু তাঁদের আদর্শকে ভুলে গিয়ে দুর্নীতি আর লোভ জীবনে প্রাধান্য পায়। "ওরে আমার ভাল নাম লেনেওয়ালারে! জেলের মধ্যে কত কাণ্ডই দেখেছি এইসব মহাত্মাজীর চেলাদের! বিসুন শুক্লা, করণজাহা ইউনিয়ন বোর্ড পুড়িয়েছে কেন জানিস তো? টাকা খেয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের, তাই হিসাবের খাতাপত্রগুলো নষ্ট করে দিল। এই আজাদদস্তার নামে নেওয়া চাঁদার টাকাও খাবে এই দশভূতে মিলে।... রেলগাড়ি আবার চলতে আরম্ভ হয়েছে। এই টাকার থলে নিয়ে নিয়ে সব বেরুবে কাজের নাম করে। "[৮]

কংগ্রেসী রাজনীতির প্রথম পাঠের এই তিক্ততা ঢোঁড়াইর মনকে বিষিয়ে তোলে। পরদিন দেখা যায় বিসুনি কেওট পালিয়েছে বন্দুক আর কার্তুজগুলো নিয়ে। চাঁদার নাম করে সে বন্দুক- উর্দি উঁচিয়ে রামনেওয়াজ মুন্সীরর কাছ থেকে দু'শো টাকা সংগ্রহ করে। বাবুসাহেবের কাছ থেকেও তিনশ টাকা নিয়ে নেয়। বাচিতর সিং, ভোপতলালরা বিশুনিকে ধরে মেরে ফেলতে চাইলে ঢোঁড়াই বারণ করে- না না, এটাকে প্রাণে মেরো না, আমার কথা রাখো। অবশেষে বাচিতর সিং নাক কেটে বিশুনিকে শাস্তি দেয়। ঢোঁড়াই এদৃশ্য সহ্য করতে পারে না, চোখ বুঁজে নেয়। ঢোঁড়াইর হৃদয়ের কোমলতার সন্ধান পাই আমরা আবারও একবার।

এই আজাদদস্তাতেই অন্য লোকেরা যখন ঢোঁড়াইর ইমানদারি নিয়ে তাকে সন্দেহ করে, বুঝিয়ে দিতে চায় ঢোঁড়াইও দলের আর দশ জনের মতোই একচুলও খাঁটি নয়, ঢোঁড়াই বুঝতে পারে- "এই অস্থির, অনিশ্চিত জীবনে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে, ভাববার ধারা চলে অপ্রত্যাশিত খাতে, ত্রস্ত চঞ্চল চোখের চাউনিতে সকলের সন্দেহের ছায়া পড়ে। কেউ কাউকে বিশ্বাস পায় না ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঝগড়া বেঁধে ওঠে। উৎসাহের ফেনা মরে এসেছে।" ইংরেজের শোষণ- শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তির যে লড়াইয়ে ঢোঁড়াইরা আজাদদস্তায় সামিল, সে লড়াইর সাফল্য এখনও শতযোজন দূরে। ঢোঁড়াই ভাবে, এত কথা, এত তর্ক, তবু রামরাজ্য স্থাপনার কথা কেউ বলেনি দলের মধ্যে। ঠিক এইসময়েই মাস্টারসাহেবের জেল থেকে বেরিয়ে ইস্তাহার প্রকাশ, যাতে লেখা- " কংগ্রেসের লোক যারা আজও ফেরারী আছেন, মহাত্মাজীর আদেশ অনুযায়ী তারা যেন সরকারের সম্মুখে অবিলম্বে নির্ভীক চিত্তে হাজির হয়ে যান। সর্বসাধারণকেও জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে এই মাসের পর কোন ফেরারী ব্যক্তিকে তারা যেন কংগ্রেসের লোক বলে ভুল না করেন। "ঢোঁড়াইর আশার আলো নিভে যায়। সে হোঁচট খেতে খেতে ছুটেছে একঘেয়েমি থেকে উদাসীনতার পথে, তারপর উদাসীনতা থেকে বিতৃষ্ণার দিকে। পথ ফুরিয়ে এসেছে।"[৯]

পথ ফুরিয়ে গেলেও ঢোঁড়াই সঠিক ঠিকানার সন্ধান পায় না। কেবলই বুঝতে পারে– "দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় দুমদাম করে। এর খুঁটিগুলো এত পলকা তা আগে জানা ছিল না। পায়ের

নিচের শক্ত মাটি তাতেও দাঁড়িয়ে যেন নিশ্চিন্দি নেই;" ঔপনিবেশিক শক্তি তথা আধিপত্যবর্গের প্রতাপ আর তার বহুধাবিস্তৃত ডালপালাগুলো যেন আরও প্রসারিত হচ্ছে। সামাজিক আর রাষ্ট্রীয় শোষণ -শাসনের রণকৌশলকে পরাস্ত করার জন্য ঢোঁড়াইর লড়াই বহুস্বরসঙ্গতির কোন পথ দেখাতে পারে না। ঢোঁড়াইদের জীবনকে সূক্ষ্ম ও স্থুল, দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবদমন করাই প্রাতিষ্ঠানিক হেগেমনীষ্টদের একমাত্র লক্ষ। এরা প্রান্তিকায়িত- ক্ষমতাহীন ঢোঁড়াইদের জীবনের পোষকতা করে না, জীবনকে নিরাকৃত করে।

উপসংহার:

যাই হোক, সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে ঢোঁড়াইয়ের উপস্থিতি পাঠকের কাছে অনেক আশাপ্রদ ও ব্যঞ্জনাময়,- কেননা এর আগে তাৎমা ধাংড়দের জীবনের পরাজয়- ব্যর্থতার কাহিনি বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়নি। সতীনাথ কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা চিহ্নিত সাহিত্যিক প্রতিবেদনের পরম্পরাগত ধারণাকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে পুরোনো সাহিত্যিক পরিসরের অচলায়তন ভাঙার প্রয়োজনীয়তা সূত্রায়িত করে দিয়েছেন। লেখক উপন্যাসের নায়ককে রামচরিত মানস এর আদলে গড়তে চাইলেও ঢোঁড়াই কখনো রাম হয়ে উঠতে পারেনা তার জন্ম-পরিবেশ-পরিসর সবকিছুই রাম হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। এই কারণেই ঢোঁড়াই সামাজিক-ঔপনিবেশিক কোনও শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হয় না শেষপর্যন্ত। তাছাড়া সতীনাথের ঈপ্সিত নায়ককে জয়ী দেখতে হলে ইতিহাসকেই পাল্টে ফেলতে হয় যা লেখকের পক্ষে সম্ভব নয়। যে ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে মধুসূদন মনের অভিলাষ থাকা সত্ত্বেও মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণ বা মেঘনাদকে জয়ী করতে পারেননি, সেই একইকারণে ঔপনিবেশিক শক্তির কৃৎকৌশলের কাছে ঢোঁড়াইকেও হেরে যেতে হয়। ইতিহাস তো অনতিক্রম্য; বহুত্ববাদী জগতের বিচিত্রগামী উদ্ভাসন যে ইতিহাসে নেই, যে ইতিহাসে প্রতাপের একবাচনিক অভিব্যক্তিই জয়ী হয়েছে ঢোঁড়াই কীকরে সেই ইতিহাসের পাতা অতিক্রম করবে! যাই হোক, ঢোঁড়াইর জীবনের সংগ্রামের কাহিনি অন্তেবাসীদের বেঁচে থাকার নতুন করে লড়াইয়ের প্রেরণা স্বরূপ। বুড়ো এতোয়ারী ধাংড় যতই ফোকলা দাঁতে হেসে বলুক, "ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক, তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাঁত গজায়।" তবুও ঢোঁড়াইদের সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না।

"যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

ঢোঁড়াইর লড়াই যে বিন্দুতে থেমে গেছে, সেই বিন্দু থেকেই শুরু হবে অন্তেবাসীদের জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম।

তথ্যসূত্র:

১। ভাদুড়ী, সতীনাথ। "নি: সঙ্গ দীক্ষা"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ঘ।
২। ভাদুড়ী, সতীনাথ। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৩৪।
৩। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২।
৪। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
৫। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৬৮।
৬। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৭৪।

৭। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৮। — — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

৯।— — —। ঢোঁড়াই চরিত মানস। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৭৯।।

১০। "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৫৩৫।

১১। "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৫৩৪।.

১২। "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৫৩৬।।

১৩। "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৫৩৬।

১৪। "গ্রন্থ প্রসঙ্গ"। সতীনাথ গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদনা শঙ্খ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯০৬, পৃ. ৫৩৮।

১৫। রায়চৌধুরী, সমীর। অপর: সংজ্ঞা নিরূপণ। হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৮।

১৬। রায়চৌধুরী, সমীর। অপর: সংজ্ঞা নিরূপণ। হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৭।

১৭। রায়চৌধুরী, সমীর। অপর: সংজ্ঞা নিরূপণ। হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১।

১৮। রায়চৌধুরী, সমীর। অপর: সংজ্ঞা নিরূপণ। হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ১১।

১৯। সামন্ত, অরবিন্দ। ইতিহাসে অপরত্ব কিংবা অপরত্বের ইতিহাস। হাওয়া ৪৯, কলকাতা, ১৯৭০, পৃ. ৮৯।